Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
UGC Approved, Journal No: 48666
Volume-VII, Issue-IV, April 2019, Page No.18-24
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বদ্‌রুজ্জামান চৌধুরীর গল্পে নির্যাতিত মানুষের কণ্ঠস্বর: নির্বাচিত গল্পের নিবিড় পাঠ

ড. কালীপদ দাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাধামাধব কলেজ, শিলচর, কাছাড়, আসাম

Abstract

Badrujjaman Choudhury is a noted figure in the world of Bengali short-stories in Barak Valley, the third epicenter of Bengali Literature. He has been published widely in the little magazines of Barak Valley, West Bengal and Bangladesh. His is the world of marginalized other. He writes about the lower depth, the grassroot periphery of Muslim Society. He has brought the Muslim Society with all its nuances along with the indiscrepancies, prevalent in the Muslim world along with the illiteracies in the third world epicenter. The subject is not safe the society is blind. Hence someone has to take pen to set things right. Badrujjaman has done this task through the writings. Among his works in the little magazine, he is widely published in 'Sahitya', a leading Bengali little magazine from Hailakandi.

For our present discussion we have choosen his three major stories as such 'Janoar', 'Manush' and 'Lakh Takar Manush'. These three stories are full of details with sin, injustice, jealousy, unkindness, that belonged to the lower muslim class strata as untouchables. The theme of the story 'Janowar' depicts the poor helpless condition of the rickshaw puller who maintains his livelihood by pulling rickshaw. The second story 'Manush', under discussion reveals factual truth of Muslim Society in the persona of Rajjak's and his wife Patabibi along with a daughter of eleven years old and two boys of six and three years old each. The third story 'Lakh Takar Manush', reveals the pictures of half-educated lower middle class people of Muslim Society. Almost all stories by him. Jostles side by side against the patriarchal society. This is a world of romanticism which gave priority to experience and observation with things of socialism and realism that voices the gory picture of the Muslim society at large that belongs to his subaltern epiphany as the other.

Keyword: Subaltern, merganilised other, patriarchal society, epiphany and Muslim Society.

উত্তরপূর্ব ভারতের বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাস খুব একটা প্রাচীন নয়। হাতে গোনা কিছু গল্প লেখকদের মধ্যেই স্বাধীনতা পরবর্তী উত্তরপূর্ব ভারতের গল্পের ভুবন আবর্তিত হয়েছে। উত্তরপূর্ব ভারতের কথা সাহিত্যের সৃজনকর্ম বিকশিত হয়ে উঠেছে অনেকটা বিলম্বিত লয়ে। এবং এর কারণ রয়েছে অনেকটা গভীরে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে উত্তরপূর্ব ভারতে লিটল ম্যাগাজিনকে কেন্দ্র করে কাব্য আন্দোলন গড়ে উঠলেও গদ্য আন্দোলন

তেমনভাবে গড়ে উঠেনি। বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকে শিলচর থেকে প্রকাশিত 'শতক্রতু' এবং হাইলাকান্দি থেকে প্রকাশিত 'সাহিত্য' পত্রিকা ছাড়া গদ্য আন্দোলনকে পৃষ্ঠপোষকতা করার মতো তেমন কোন প্রকাশ মাধ্যমকে উত্তরপূর্ব ভারতে দেখতে পাওয়া যায় না।

তবু যেখানে বাঙালি জাতিসত্তা রয়েছে, সেখানে তার সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকশিত হয়ে উঠবেই। হয়তো বা কিছুটা বিলম্বিত লয়ে। কালের নিয়মেই উত্তরপূর্ব ভারতে যে সকল কথা শিল্পীকে আমরা দেখতে পাই এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন- মিথিলেশ ভট্টাচার্য, শ্যামলেন্দু চক্রবর্ত্তী, শেখর দাশ, স্বপ্না ভট্টাচার্য, অরিজিৎ চৌধুরী, রণবীর পুরকায়স্থ, বিজয়া কর, দেবব্রত চৌধুরী, ঝুমুর পাণ্ডে ও বদ্‌রুজ্জামান চৌধুরী প্রমুখ। যাঁদের লেখা গল্প বৃহত্তর বাংলার ভুবনে আজ সমাদৃত। এঁদেরই একজন বদ্‌রুজ্জামান চৌধুরী। তাঁর 'লাখ টাকার মানুষ' (প্রকাশ কাল ২০০৩ ইং) গল্প গ্রন্থটি আমাদের আলোচনার উপজীব্য। 'লাখ টাকার মানুষ' গল্প গ্রন্থটি উত্তরপূর্ব ভারতের বাংলা সাহিত্যের গল্পের ভুবনে এক অনন্য সংযোজন।

'লাখ টাকার মানুষ' বদরুজ্জামানের প্রথম গল্প সংকলন। যার প্রকাশ কাল ২০০৩ সাল এবং প্রকাশক সাহিত্য প্রকাশনী, হাইলাকান্দি। বদ্‌রুজ্জামান চৌধুরী বর্তমান সময়ের এক বিশিষ্ট গল্পকার। আসামের করিমগঞ্জ জেলার বদরপুরের কাছে মালুয়া গ্রামে তাঁম জন্ম ১৯৪৬ সালে। গ্রামেই তিনি মানুষ হয়েছেন। পেশায় তিনি শিক্ষক। গ্রামের সাধারণ মানুষ, অর্ধশিক্ষিত মানুষ, অশিক্ষিত মানুষ ও কৃষক শ্রমজীবি মানুষের মধ্যেই তাঁর বসবাস এবং তাঁর সাহিত্যচর্চার প্রেক্ষাপটও গ্রামের অবহেলিত, নির্যাতিত, নিপিড়িত মানুষের দিনলিপি। যে প্রান্তিক গ্রামগুলিতে এখনও শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিলাসিতা মাত্র, যে গ্রামগুলির আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে নারী ভোগ্যপণ্য মাত্র, যে গ্রামগুলিতে ধর্মীয় বিধান, সামাজিক নিয়মই একমাত্র শেষ কথা, নারীর আলাদা কোন কণ্ঠস্বর নেই, তাদের কথাই, তাদের জীবন যাপনই বদরুজ্জামানের গল্পে উঠে আসে।

"বদ্‌রুজ্জামান সেইসব গল্পকারদের একজন নন যাঁরা কেবল জীবনের আলোকিত দিককে আলোকিত করার চেষ্টা করেছেন। বরাক উপত্যকার মুসলমান সমাজ, তার সংস্কার, কুসংস্কার, গ্রামের অশিক্ষিত অল্প শিক্ষিত মুসলমান নারী পুরুষের ব্যথা ও বেদনার কাহিনি তিনি যে ভাবে গল্প নিয়ে এসেছেন তা বাংলা সাহিত্যে, আমাদের এ দেশের বাংলা সাহিত্যে এক নতুন অভিজ্ঞতা। ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বদ্‌রুজ্জামান যে সব সার্থক গল্প লিখেছেন তাতে তাঁর কব্জির জর, অসীম সাহসেরও পরিচয় মেলে। বিষয় নিরাপদ নয়, সমাজ ধর্মান্ধ, কিন্তু বদ্‌রুজ্জামান অকুতোভয়।"[১] এইভাবেই বদরুজ্জামানের পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে তাঁর অগ্রজদের ভাষায়।

"বদ্‌রুজ্জামান মূলত বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকের গল্প লেখক। আজও তাঁর সৃজন কর্ম অব্যাহত। লিখেছেন বহু পত্রপত্রিকায়-স্বীকৃতিও পেয়েছেন প্রচুর, যার মধ্যে রয়েছে: ছোটগল্পে সোনার কাছাড় (শিলচর) পদক প্রাপ্তি, ১৪/০৮/৮০। গুণিজন সংবর্ধনা, ঝিনুক সাংস্কৃতিক সংস্থা, বদরপুর, ৯ফা: ১৩৯৩। গুণিজন সংবর্ধনা, গণতান্ত্রিক লেখক সংস্থা, ১০/০১/৯৭। গুণিজন সংবর্ধনা, কাটিগড়া (কাছাড়) স্পোর্টস এসো: ২১/০৫/২০০০। গুণিজন সংবর্ধনা উত্তর বঙ্গ নাট্যজগৎ, শিলিগুড়ি ১৪০৪। গুণিজন সংবর্ধনা, ভাষা শহীদ স্মারক সমিতি, শিলচর ১৯/০৫/০১। গুণিজন সংবর্ধনা, লিটলম্যাগ লিটারারি ক্লাব, শিলচর ১৪/১১/১৪০০। গুণিজন সংবর্ধনা, করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসন, ২৬/০১/২০০০। এ অঞ্চলে থেকে প্রকাশিত বরাক পারের গল্প (শিলচর); বরাক উপত্যকার নির্বাচিত গল্প (করিমগঞ্জ); উত্তর পূর্বের নির্বাচিত গল্প (আগরতলা); অসীমান্তিক (আগরতলা)- গল্প সংকলনগুলোতে লেখকের গল্প অন্তর্ভুক্ত।

১৯৭৮ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পত্র-প্রকাশিত গল্পগুলির মধ্যে ১৮টি গল্প 'লাখ টাকার মানুষ' সংকলনটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গল্পগুলি হল- 'জানোয়ার', 'পরবাস', 'ঘুমানো', 'কবিতা শরীরে', 'আমরা সবাই ভালো আছি', 'অশ্লীল', 'মানুষ', 'প্রতিরোধ ক্রমশ স্তব্ধ', 'ফুলজান বিবির কথামালা', 'মানুষ এখনো মানুষ',

'কেচ্ছা', 'বিসর্জন', 'জাত বেজাতের কল্প কথা', 'বহুবল্লভা', 'উপলব্ধি', 'শব্দ নাহি', 'একখানা জীবনীর প্রথম অধ্যায়', 'লাখ টাকার মানুষ' ও 'অন্নদাত্রী'। প্রতিটি গল্পেই গ্রামীণ মানুষের দারিদ্রতার ছবি, শোষণের ছবি, প্রেম-ভালবাসা, আশা-আকাঙ্ক্ষার ছবি ভেসে উঠেছে। এই ১৮টি গল্পের মধ্যে আলোচনার সুবিধার জন্য তিনটি গল্পকে এই প্রবন্ধে বেছে নেওয়া হয়েছে। গল্পগুলি যথাক্রমে- 'জানোয়ার', 'মানুষ' ও 'লাখ টাকার মানুষ'। এই তিনটি গল্পেই গ্রামীণ জীবনের পাপ, অন্যায়, অবিচার, ইর্ষা, নীচতা, ক্ষুদ্রতা, দ্বেষ, মাৎসর্যের নানা ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। 'জানোয়ার' (১৯৭৮) গল্পটির প্রেক্ষাপট বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকের বরাকের একটি প্রান্তিক গ্রাম। যা আজকের আধুনিক নগর জীবনের ফেলে আসা অতীত। যে পাঠকেরা গ্রাম জীবনে অভ্যস্ত নন, গ্রামীণ পরিবেশ যাঁদের অভিজ্ঞতার বাইরে তাঁরা এই গল্পের গভীরে পৌঁছতে বাধাপ্রাপ্ত হবেন। 'জানোয়ার' গল্পের প্রধান অবলম্বন গচ্ছে মালিকের কাছ থেকে ভাড়া করা রিক্সা নিয়ে রিক্সা চালক আছিম শেখের দরিদ্র ক্লীষ্ট জীবনের বৃতান্ত। এই দরিদ্র ক্লীষ্ট জীবনের চারপাশেও যে ঔপনিবেশিক মনোভাবাপন্ন জোতদার, মহাজন, সুদখোর মানুষের অভাব নেই, এই গল্পের নঈমুদ্দীন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমরা গল্পের মধ্যে দেখতে পাই নঈমুদ্দীনের মতো রিক্সার মালিক কিভাবে শোষণ করছে আছিম শেখের মতো হত দরিদ্র রিক্সা চালককে। নঈমুদ্দীন দু-বার হজ করে আসলেও সে একজন শোষক, সুদখোর ও জোতদার প্রকৃতির লোক। তাকে লোকে আড়ালে আবডালে 'মক্ষীচূষ শাইলক' গালি দিলেও সামনে কিছু বলতে পারে না। গল্পের শুরুতেই আমরা নঈমুদ্দীনের পরিচয় পাই এভাবে— "পনেরো খানা রিক্সার মালিক হাজি নঈমুদ্দীনের চিবুক ভর্তি কাঁচা দাড়ি। হজ্ব করে এসেছে দু'বার। মাথা সবসময় নকশি চাদর দিয়ে ঢাকা। জোব্বা পায়ের গোড়ালি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। পরিবার নিজে ছেলেপুলে মিলিয়ে ছ'জন। ক্ষেতের চাকর আর দাসদাসী মিলিয়ে দশ থেকে বারো। চল্লিশ কেদার জমি, ধান বেচে যা আয় হয় তা সবই বেনামী সুদি কারবার ফুলেফেঁপে ওঠে।"[২]

প্রচণ্ড গরমের মধ্যে আছিম শেখ সারাদিন রিক্সা চালিয়ে ১২ টাকা রোজগার করে। পুরো টাকাটাই নঈমুদ্দীন কেড়ে নিতে চায়। আছিম শেখ নঈমুদ্দীনকে জানায়- "আজ মাত্র দশ টাকা পয়দা করেছি মিয়া সাহবে। দু'টাকার জন্যে মিথ্যা বলে আছিম, চায়ের দোকানে তিন টাকা জমেছে, ঘরে চাল, তেল, আলু নিয়ে যেতে হবে। বাচ্চা ছোটটার জ্বর। তার জন্যে ওষুধ, আর সাগু চিনি। আজকের ভাড়াটা লেন, বাকি তিনদিন আস্তে আস্তে দোব।"[৩] আছিমের এই কথার মধ্য দিয়ে তার নিপীড়িত জীবনের প্রতিচ্ছবি ফোটে উঠে। শোষক রিক্সা মালিক নঈমুদ্দীন আছিমকে সাফ জানিয়ে দেয় পুরো টাকা না দিলে কাল থেকে আর আছিম রিক্সা পাবে না। আছিম নঈমুদ্দীনের পা জড়িয়ে ধরে- "আল্লার ওয়াস্তে আমাকে রহম করেন মিয়া সাহেব, আমার বাল-বাচ্চা সকাল থেকে উপোস করে। বৌটা বাচ্চা বিইয়েছে, দু'মাস, খেতে না পেয়ে ওর বুকের দুখ পায় না বাচ্চাটা। জ্বরে বাচ্চাটা আরো নেতিয়ে পড়েছে। খেতে দিতে পারি না। ওষুধ নেব হেমোপাথি"।[৪] নঈমুদ্দীনের কিন্তু কোনো মায়া হয় না। উল্টো আছিমকে বলে- "মেলা ফিচলেমি করিস নে, ভাল লাগে না আছিম, টাকাটা দিয়ে দে। তোর বাড়ির প্যাঁচাল আমাকে শুনিয়ে লাভ কী।"[৫] আবার গল্পের মাঝখানে এসে জুটেছে ছোটখাটো জোতদার গোছের লোক সাবের মিয়া। এসে নঈমুদ্দীনের পক্ষ নেয় এবং নঈমুদ্দীনের পুরো টাকাটা আছিমকে দিয়ে দিতে চাপ সৃষ্টি করে। আর আছিমের মতো নির্যাতিত দরিদ্রদের অকারণে ছোটলোক বলে গালাগাল করে সাবের মিয়া। শেষ পর্যন্ত সারাদিনের রোজগার ১০ টাকা আছিম তুলে দেয় নঈমুদ্দীনের হাতে আর বাকি দু'টাকা চায়ের দোকানের মালিক গোকুল দাসের প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়ে খালি হাতে আছিম বাড়ি ফিরে।

"সকালে খেয়ে বেরোয়নি আছিম। সারাদিনে দু'কাপ চা, একটা বিস্কুট, এক বাণ্ডিল বিড়ি। মাথাটা ঘুরছে। হাতেধরা রিক্সার বাতিটা উসকে দিকে কাদাভরা পথে হাঁটতে লাগল আছিম। ফতেমা হয়ত উপোস বাচ্চাগুলো নিয়ে পথের দিকে চেয়ে। তিনটে বাচ্চা বিইয়েছে ফতেমা, দু'টো আছে, একটা মরেছে। এই ক'বছরে ফতেমার দেহে হাড়গুলো স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়েছে। চোখের কোণে কালি পড়েছে, পিঠে তার কালচে কালচে দাগ আছিমের প্রহারের চিহ্ন। প্যাঁচপ্যাঁচে বৃষ্টিতে একটা ব্যাঙ রাস্তায় বসেছিল। আছিম ব্যাঙটাকে জোরে একটা লাথি কষাল। কোঁক

করে দূরে ছিটকে পড়ল ব্যাঙটা।"[৬] উদ্বৃত অংশে আমরা দেখতে পাই আছিম মাঝে মধ্যে ফতেমাকে প্রহার করে এবং এই প্রহার যে দরিদ্র জীবনের যন্ত্রণার বহিপ্রকাশ তা চোখের সামনে ভেসে উঠে। এখানেই এক মানবিক দ্বন্দ্বের কথা উঠে আসে। আছিম কি তার বৌকে ভালোবাসে না? না অভাবের যন্ত্রণায় বাধ্য হয়ে বৌকে নির্যাতন করে। আবার এওতো এক ধরণের পুরুষতন্ত্রেরই বহিপ্রকাশ। নারী নির্যাতনের অন্যরকম অভিব্যক্তি।

আছিম ঘরে পা দিতেই ফতেমার কণ্ঠস্বর, 'কই কিছু আনোনি?' আছিম কি বলবে, বলারই বা আছে কি? এদিকে ওষুধ ছাড়া, দুধ-সাগু ছাড়া অসুস্থ বাচ্চাটা একেবারেই নেতিয়ে পড়েছে। "কিছু ন্যাকড়া দিয়ে ঢেকে রোগে ক্ষুধায় নির্জীব বাদশাকে পোঁটলার মতো শুইয়ে রেখেছিল ফতেমা। ন্যাকড়াটা বাহ্যিতে দুর্গন্ধে গেছে, অন্য একটি ন্যাকড়া হাতে ফতেমা বাদশার কাছে গিয়ে দেখল, নড়াচড়া করছে না বাচ্চাটা। শুধু চোখ দুটো মেলে মা'র দিকে তাকিয়ে ঠোঁট ভেঙে একটু হাসল, ক্ষুধার্ত রোগ জর্জর শিশুটার মুখে কিসের হাসি কে জানে। রক্তে ব্যাহ্যিতে ভরে গেছে ন্যাকড়াটা। ফতেমা তাড়াতাড়ি বাচ্চাটাকে ন্যাকড়া বদলে কোলে তুলে নেবার আগেই আস্তে আস্তে চোখ বন্ধ করল বাদশা। ছোট্ট পা হাতগুলো দু'তিনবার ছুড়ল। কষ বেয়ে তরল সাদামত কিছু বেয়ে পড়ল। তারপর সব শেষ। ডুকরে উঠল ফতেমা, বাদশা আমার, বাবা আমার, পুত আমার, যাদু আমার...।"[৭] আছিম নিশ্চেষ্ট নির্বাক ঘরের দাওয়ায় বসে থাকে। ভুখে পেটে তার আগুন জ্বলছে। কান্না কাটির শব্দে পাড়া প্রতিবেশী জমল। আছিমের ছোট বাদশা মরে গেছে। হাজি নঈমুদ্দীন খবর পেয়েছে, খবর পেয়ে আছিমের বাড়িতে এসেছে খয়রাত দিতে, কাফনের জন্য। কারণ খয়রাতে বেহেশ্তের দরজা খোলা থাকে। নঈমুদ্দীন আছিমের মৃত বাচ্চা বাদশার কাফনের জন্য পাঁচ টাকা খয়রাত দেয়। রক্তের মত লাল টকটকে চোখ দুটো তুলে হাজি নঈমুদ্দীনের দিকে তাকায় আছিম। দৃষ্টিতে ক্রোধ ও ঘৃণা উপচে পড়ছে আছিমের। গল্পের শেষ পর্বে আমরা আছিমের আরো এক মানবিক দ্বন্দ্বের চিত্র দেখতে পাই- "অনেক রাতে, তখন বাদশাকে কবরে শুইয়ে দেয়া হয়ে গেছে, একে একে সবাই বিদায় নিয়ে ফিরে গেছে, আছিমের অভুক্ত মেয়ে রহিমা ঘুমে অচেতন, শুধু ফতেমা জেগে, তখন আছিম আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। ঘরে ঢুকে আস্তে আস্তে ফতেমার দিকে এগিয়ে গিয়ে বাতিটা এক ফুঁইয়ে নিভিয়ে দিল। তারপর ফতেমার গায়ের কাপড় খুলতে লাগল অন্ধকারে। ফতেমা অবাক, ক্রুদ্ধ নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করেও পারল না। তাকে উদ্যোম করে আষ্টে পৃষ্টে জড়িয়ে ধরেছে আছিম। ফিস ফিস করে বলল, আরেকটা বাদশা তৈরি করতে চাইরে ফতেমা, আরেকটা বাদশা। নইলে হাজি নঈমুদ্দীন কার কাফণের জন্য আবার পাঁচ টাকা খয়রাত করে বেহেশতের টিকিট-করবে? একটা জান্তব প্রতিহিংসায় উৎপীড়িতা হতে থাকল ফতেমা।"[৮] উদ্বৃত অংশে একদিকে যেমন দেখি ফতেমার জীবনে শারীরিক ও মানসিক উৎপীড়ন, আবার নঈমুদ্দিনের মতো খলনায়কদের বিরুদ্ধে আছিম-ফতেমার প্রতিবাদেরও কণ্ঠস্বর। গল্পটির সমগ্র শরীর জুড়ে আমরা লক্ষ্য করি এক মানবিক মূল্যবোধের টানাপোড়েন ও দ্বন্দ্ব। কারণ গল্পটির শিরোনাম 'জানোয়ার' এই নামকরণ থেকে একটি বিষয় প্রতিপন্ন হয়, যে মানবিকতার উল্টো মেরুতে দাঁড়িয়ে আছে এই জানোয়ার শব্দটি। গল্পের একদিকে যেমন রয়েছে নঈমুদ্দীন-আছিমের শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্ব ঠিক অন্যদিকে রয়েছে আছিম ও ফতেমার মানসিক দ্বন্দ্ব বিন্যাসের সঙ্গে মানবিক ও জান্তব প্রতিহিংসার দ্বন্দ্ব।

আমাদের আলোচনার দ্বিতীয় গল্প হচ্ছে 'মানুষ'। এই গল্পেও আমরা গ্রামীন জীবনের দরিদ্র ক্লীষ্ট মানুষের জীবন যাপনের দৃশ্য দেখতে পাই। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র রাজ্জাকের মিয়া হলেও গল্পটি আবর্তিত হয়েছে রাজ্জাকের স্ত্রী পাতাবিবি ও তাদের এগারো বছরের একটি মেয়ে আর ছয় ও তিন বছরের দুটি ছেলেকে কেন্দ্র করে। রোগক্লিষ্ট দরিদ্র রাজ্জাকের অভাবে সংসারে তিনটি বাচ্চাকেই ভিক্ষে করার জন্য পাঠাতে বাধ্য হয় রাজ্জাক ও রাজ্জাকের স্ত্রী। "তিনটে বাচ্চা ভিক্ষে করতে বাইরে গেছে, চতুর্থটা গোরে গিয়েছে। এই পঞ্চমটাও হয়তো যাবে। কুড়ি দিনের পোয়াতি পাতা বিবিকেও প্রায় দিন উপোষ দিতে হয়। বাচ্চাটা এখন আর 'মাই' টানতে চায় না। পেটভর্তি জল থাকলে বুকে রস আসে কোত্থেকে?"[৯]

রাজ্জাক আগে রিক্সা চালাতো এখন অসুস্থতার জন্য কাজ করতে পারে না। তাই বাচ্চাগুলোকে ভিক্ষে করেই উদরপূর্তি করতে হয়। পাতাবিবির খুব কষ্ট হয় কিন্তু কি করবে কিছুই করার নেই— "সমস্ত দিন রোদে হেঁটে হেঁটে বাচ্চাগুলোর বেহালের সীমা থাকে না। তিন বছরের ছেলেটা বেশি হাঁটহাটি করতে পারে না। মেয়েটা এগারোয় পড়েছে এবার। সে একে কোলে করে হাঁটে। বছর ছয়ের ছেলেটাও খালি পেটে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আজ সে বেরোতে চায়নি। তার পায়ে ব্যথা হয়েছে। সে হাঁটতে পারবে না। পাতা প্রথমে তাকে বুঝিয়েছে। ফ্যানের পরিমাণ একটু বাড়িয়ে খাইয়েছে। তবুও ছেলে রাজি না হওয়াতে দু'টো চড় দিয়েছে। নবাবের ব্যাটা, হাঁটতে পারবে না! হাঁটতে পারবি না তো খাওয়া বন্ধ কর। তা'নয়, গর্তটা শুধু হাঁ করেই আছে, ভর্তি হয় না।"[১০]

রাজ্জাক বাঁধা দিয়েছে- আহা মারছিস কেন? ওর তো মানুষের শরীর। মাসুম বাচ্চা। এগারো বছরের মেয়েটা, ছয় ও তিন বছরের ছেলে দুটি প্রতিদিন আহারের সন্ধানে রোদ পোড়ে ও বৃষ্টিতে ভিজে মাইল পনেরো পায়ে হেঁটে খাবারের সন্ধান করে। পাতাবিবি তা সহ্য করতে পারে না। কারণ বাচ্চাগুলো যে পাতাবিবির একেকখানা বুকের পাঁজর। চড় বসাতে আরাম লাগে না পাতাবিবির। বুকের ভেতর পেরেক পোতার মতো কষ্ট হয়। এভাবেই রাজ্জাক-পাতাবিবির সংসারের করুণ কাহিনি লেখক তুলে ধরেন। কাহিনি বিন্যাসের জন্য রহিম শেখের স্ত্রীর গল্প, উমেশ দাসের বাপের পিসির গল্প। চৌধুরী বাড়ির বুড়ির কাছ থেকে মুরগির বাচ্চা ভাগে এনে পাতাবিধির পালন করার গল্প, যে মুরগির বাচ্চাটিকে শেয়াল ধরে নিয়ে গেছে। আর এর বিনিময়ে পাতাবিবি চোর বদনাম পেয়েছে। তবে চুরি যে একেবারে করে না পাতাবিবি বা তার স্বামী এমন নয়। এই যেমন ক্ষিরেটা, ঝিঙ্গেটা। লাকড়ি কেনার পয়সা নেই রাস্তার ধার থেকে কারও হয়ত বেড়া ভেঙ্গে এনেছে, এই যা। এটাকে চুরি বলা যায় না। চুরির অপবাদে খুব রাগ হয় পাতাবিবির কিন্তু রাগ সামলে রাখে। কারণ বড়লোকের কথায় রাগ করলে বিপদ হয়। রাজ্জাক ও পাতাবিবি নিজের কিসমতকেই দোষারূপ করে। এই যে প্রতিবাদ বিহীন প্রতিবাদ রাজ্জাক-পাতাবিবির কণ্ঠস্বরকে যেন আরো শানিত করে তুলেছে। কাহিনিটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চৌধুরী সাহেব, রাকেশ দাস, হরি চক্রবর্তী ইত্যাদি নানা চরিত্রের নানা বিভঙ্গ সৃষ্টি করে লেখক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। গল্পটির শেষ পর্বে এসে আমরা দেখতে পাই রাজ্জাক ও পাতাবিবির ভিক্ষে করতে বেরিয়ে যাওয়া ছেলেমেয়ে তিনটি শকুন তাড়িয়ে মরা গরুর কাছে আহারের সন্ধানে গেছে। বাচ্চাদের বাড়ি ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে রাজ্জাক বাচ্চা তিনটিকে খুঁজতে গিয়ে, মরা গরুর কাছে পেয়েছে। তিন বছরের বাচ্চাটির মুখটা বন্ধ রয়েছে। রাজ্জাক বাচ্চাটিকে ধমক দেয় মুখ খোলার জন্য- "মুখ দেখি, হাঁ কর! ছেলেটা হাঁ করে না। ছুটে পালাতে যাচ্ছিল। রাজ্জাক তাকে ধরে ফেলে। কেঁদে ফেলে বাচ্চাটা। জলভরা চোখে মিনতি করে মেয়েটা, বাবা, আমাদের খুব ক্ষিধি পেয়েছিল! সমস্ত দিন হেঁটেও আমরা কিছু খেতে পাইনি। আমাদের খুব ক্ষিধে পেয়েছিল বাবা! আমাদের মেরো না বাবা, দোহাই তোমার! শক্ত হাতের চড় খেয়ে ছেলেটা চিৎকার করে কেঁদে উঠে। মুখ থেকে খসে পড়ে একটুকরো মাংস!"[১২] রাজ্জাকের 'শক্ত হাতের চড়' শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে থাকল 'মানুষ' গল্পের সমাপ্তিতে।

আমাদের আলোচনার তৃতীয় গল্প হচ্ছে 'লাখ টাকার মানুষ'। আর এই শিরোনাম গল্পটি দিয়েই গল্প গ্রন্থের নামকরণ করা হয়েছে। মোট আঠারোটি গল্পের মধ্যে এই গল্পটি সবচাইতে বেশি দীর্ঘ। প্রায় ছয়ত্রিশ পৃষ্ঠায় বিন্যস্ত এই গল্পের অবয়ব। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র রেণুবিবি ও নাতনী আসমানতারা। রেণুবিবির জীবন বৃত্তান্তই গল্পের মূল বিষয়। অন্যান্য চরিত্র ও কাহিনিগুলো রেণুবিবিকেই আবর্তন করেই ঘোরাফেরা করছে। রেণুবিবি মুসলমান বিধবা মহিলা ও তার মেয়ে হারা নাতনিটিকে নিয়েই তার সংসার। অভাবের সংসার হলেও বাড়ির ফায়ফসল বিক্রি করে দুটি প্রাণীর কোনক্রমে চলে যায়। রেণুবিবি মেয়ে ফুলুকে বিয়ে দিয়েছিল কিন্তু স্বামী তাকে ছেড়ে চলে গেছে শুধু রেখে গেছে তার ঔরসজাত এক কন্যা সন্তানকে। সে আসমানতারা। মেয়েটিকে রেখে ফুলুও খুব তাড়াতাড়ি এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। রেণুবিবি একমাত্র নাতনিটিকে লালন পালন করে বড় করেছে অনেক কষ্টে। আসমানতারা এখন অনেক বড় হয়ে গেছে। এখন তার পূর্ণ যৌবন। তাকে নিয়ে রেণুবিবির চিন্তার শেষ নেই। গল্পের মধ্যভাগে এসেছে বশীর, বশীরের স্ত্রী, বশীরের ভাই কাদির, বশীরের মা, বশীরের ভাই কাদিরের বউ হানুফা প্রভৃতি চরিত্র।

এছাড়াও রয়েছে আরো কিছু চরিত্র যথাক্রমে- ফারুক, মতিন, বিলাল, খালিক, জমিরুদ্দিন, ভিখারিনী, পাড়াপ্রতিবেশী, ক্বাজি সাহেব, ইয়াসিন আসমানতারার বাবা, আব্দুছ সালাম ও নশা মিয়া।

দীর্ঘ গল্পটির শরীর জুড়ে রয়েছে গ্রামের অর্ধ শিক্ষিত, অশিক্ষিত, নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিচ্ছবি। লাউ ও কাঁচ কলার দাম আনতে বশীরের বাড়ি গিয়ে ছিল রেণুবিবি আর আসমানতারা বাড়িতে একাই ছিল। বশীরের বাড়ি যাওয়ার পথ থেকে আরম্ভ করে বশীরের বাড়িতে যাওয়া পর্যন্ত বশীরের বাড়িতে যে ধুন্ধমার কাণ্ড ঘটে গেল রেণুবিবির সামনে। অর্থাৎ বশীর তার স্ত্রী কে তালাক দিয়েছে এবং তা কিভাবে ক্বাজীর বাড়ি থেকে ফরমান নিয়ে মীমাংসা করা ও অন্যান্য ঘটনা নিয়ে রেণুবিবি চরিত্রটি এগিয়ে গেছে। আর এদিকে রেণুবিবির অবর্তমানে আসমানতারার বাবা ও তার নতুন বউয়ের ভাই আব্দুছ সালাম আসমানতারাকে প্রায় জোর করে তুলে নিয়ে যায় বিয়ে দেওয়ার জন্য। এবং বিয়ে দিয়ে কাবিন আদায় করতে চায় আসমানতারার বাবা। এই কাবিনের দাম পঞ্চাশ হাজার টাকা। আর তার সম্বন্ধী আব্দুছ সালাম আরো একধাপ এগিয়ে বলে লাখের কম মোটেই হবে না। নিজের ঔরসজাত কন্যা সন্তানকে নিয়ে কাবিনের নামে এই য়ে দামদর তা এক মানবতা স্খলনের নজির বলা যায়।

রেণুবিবি যখন কাদিরদের সাথে কাজির বাড়ি গিয়েছিল এবং ফিরে আসতে রাত হবে বলে আসমানতারা কে পাহারা দেওয়ার জন্য কাদির নশা মিঞাকে পাঠিয়েছিল। কিন্তু নশা মিঞা আসমানতারাকে তার বাপের কাছ থেকে কিছুতেই বাঁচাতে পারেনি। রেণুবিবি যখন বাড়িতে এসে আসমানতারাকে দেখতে না পেয়ে অস্থির হয়ে উঠে এবং নশা মিঞাকে জিজ্ঞেস করে আসমানতারা কোথায়? এবং এরই জবাবে নশা মিঞা জানায়- "ওর বাবায় আইছিলো, সঙ্গে ওর ষণ্ডার মতো সম্বন্ধী, ওরা ওরে বিয়া দিতে লইয়া গেলো, ওর বাপে কয় কাবিন পঞ্চাশ হাজার, ওর সম্বন্ধীয়ে কয় এক লাখোর কমে ওরে মোটেই দিতে দিবো না, কী আনকোরা জিনিষ।"[১২]

এই প্রবন্ধে আলোচিত তিনটি গল্প ছাড়াও বদরুজ্জামানের উল্লেখযোগ্য গল্পগুলির মধ্যে 'ফুলজান বিবির কথামালা', 'বহুবল্লভা' ও 'অশ্লীল' ইত্যাদি গল্পগুলিতে তিনি নিম্নবিত্ত মুসলমান সমাজের নারীর অসহনীয় অবস্থান ও মানবিক দ্বন্দ্বের পরাকাষ্ঠা তৈরি করেছেন। প্রতিটি গল্পেই উঠে এসেছে সামাজিক কু-প্রথা, কুসংস্কার ও পুরুষতন্ত্রের প্রতাপ। তবে গল্পকার প্রতিবাদের ভাষাও গেঁথে দিয়েছেন প্রতিটি গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলির সংলাপে।

উল্লেখপঞ্জী:

১/ চৌধুরী, বদরুজ্জামান, *লাখ টাকার মানুষ*, ২০০৩, হাইলাকান্দি, পরিচিতি অংশ।
২/ তদেব, *জানোয়ার,* পৃ-৭।
৩/ তদেব, পৃ-৮।
৪/ তদেব।
৫/ তদেব, পৃ-৯।
৬/ তদেব, পৃ-১০।
৭/ তদেব, পৃ-১১।
৮/ তদেব, পৃ-১২।
৯/ তদেব, মানুষ, পৃ-২৮।
১০/ তদেব, পৃ-২৯।
১১/ তদেব, পৃ-৩৩।
১২/ তদেব, *লাখ টাকার মানুষ*, গল্প, পৃ-১৪৩।

গ্রন্থপঞ্জী:

১/ চৌধুরী, বদ্‌রুজ্জামান- *লাখ টাকার মানুষ*, ২০০৩, সাহিত্য প্রকাশনী, হাইলাকান্দি।
২/ ভট্টাচার্য, তপোধীর- *প্রতীচ্যের সাহিত্য তত্ত্ব*, ২০০৬, তৃতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
৩/ মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার- কালের পুত্তলিকা, ২০১১, চতুর্থ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
৪/ সেন, অঞ্জন- *ঔপনিবেশিকতা থেকে উত্তরআধুনিকতা*, ২০১১, প্রথম প্রকাশ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।